৮
ইরান

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে ইরানে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন উর্দু-ফার্সী ডিপার্টমেন্টের প্রধান আফতাব আহমদ সিদ্দিকী। এয়ারপোর্টে ইরান সরকারের প্রতিনিধি আমাদের বিদায় জানাতে আসেন। করাচী এয়ারপোর্টে আমাদের কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন প্রতিনিধি আমাদের দলে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ সরকারী কর্মচারী জনাব মমতাজ হাসান। তিনি ছিলেন আমাদের দলের নেতা। পরে শুনেছি আমরা যখন এয়ারপোর্টে বসা (এটা ৩০শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা) তখন ডক্টর আলী আশরাফ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি।

ইরানী প্লেনে এক প্যাকেট করে খাবার পরিবেশন করা হয়, তার মধ্যে ক্যাভিয়ার ছিলো। এর আগে আর কোনো প্লেনে ক্যাভিয়ার পরিবেশন করতে দেখিনি। কারণ ক্যাভিয়ার যে মাছের পেটে হয় সেটা পাওয়া যায় রাশিয়া এবং ইরানের মধ্যবর্তী কাসপিয়ান সাগরে। অন্য দেশে এটা অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। ক্যাভিয়ার ইলিশের আন্ডার মতোই, কিন্তু আকারে একটু বড়। যাদের অভ্যাস নেই তারা এটা খেতে পারে না। ছাত্রজীবনে শেক্সপিয়রের এক নাটকে সম্ভবত হ্যামলেটে, আমরা উলুবনে মুক্তো ছড়ানো কথাটা যে অর্থে ব্যবহার করি সে অর্থেই তিনি লিখেছিলেন যে সাধারণ লোকদের ক্যাভিয়ার খেতে দেওয়া অর্থহীন। তারা এর স্বাদ বা লজ্জত গ্রহণ করতে পারে না। এটা শুধু শিক্ষার ব্যাপার নয়, অভ্যাসেরও ব্যাপার। সেটা বুঝলাম যখন উর্দু বিভাগের প্রধান চমকে উঠে আমাকে বললেন, 'ইয়ে নেহি খা সেকতা।' আমি তাঁকে একটু খেয়ে দেখতে অনুরোধ করলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

ইরানে এটা ছিল আমার দ্বিতীয় সফর। এর আগের বছর সত্তর সালেই তেহরানে এক পাকিস্তানী ডেলিগেশনের প্রধান হিসাবে আমি এসেছিলাম। এই অক্টোবর মাসেই। আরসিডি দেশগুলি অর্থাৎ পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডিগ্রীর সমন্বয় সাধন করা ছিলো আমাদের লক্ষ্য। এবার এসেছিলাম আমরা রেজা শাহর ইরানী রাজতন্ত্রের দু'হাজারতম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে যে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। অনুষ্ঠান হয় শিরাজে। এর অনতিদূরে দারাইউসের প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। ইংরেজীতে এর নাম পার্সেপোলিস। আর ফার্সীতে বলা হয় তখতে জামশিদ। আমরা প্রথম রাত্র তেহরানে কাটিয়ে পরদিন প্লেনে শিরাজ যাত্রা করি।

লক্ষ্য করলাম যে এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে শাহ এক এলাহী কারখানা ঘটিয়েছেন। বহু নতুন দালান কোঠা তৈরী হয়েছে। ইরানের ইতিহাস এবং কালচার সম্পর্কে বহু বই ছাপা হয়েছে। এবং কয়েক শ' তরুণ-তরুণীকে ইংরেজী, ফরাসী, আরবী, তুর্কী ও রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষা শেখানো হয়েছে। এরাই ছিলো প্রতিনিধিদের গাইড। আমাদের সঙ্গে যে মেয়েটি ছিলো সে চমৎকার ইংরেজী বলতো।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিরাজে ইরান বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের বিখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রথম তাঁকে দেখলাম। শিরাজে আমার পূর্ব পরিচিত ডঃ হোসাইন নসরের সঙ্গে দেখা। তিনি একদিন পুরানো এক সরাইখানায় নিয়ে গেলেন। সেখানে ফালুদার শরবত খেতে দিলেন। এই সরাইখানার পরিবেশ ছিলো এ্যান্টিক বা প্রাচীন। দেখলাম লম্বা জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি সেতারের মতো এক রকম বাদ্যযন্ত্র সহকারে কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। হোসাইন নসর বললেন শাহনামা থেকে আবৃত্তি শোনানো হচ্ছে। আমার মনে হলো গ্রীক কবি হোমার যেভাবে ইলিয়ড এবং ওডেসি শোনাতেন, এ যেনো সে রকমই একটা ব্যাপার।

যেদিন শিরাজে পৌঁছুই তার পরদিন প্রধান অনুষ্ঠানটি হবার কথা। প্রথম আমাদের যে জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে সাইরাসের কবর ছিলো। শাহ এবং তাঁর উজির সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শাহ একটি অভিনন্দন পত্রে সাইরাসকে পারস্যের প্রথম নৃপতি হিসাবে সালাম জানালেন। কিন্তু লক্ষ্য করলাম মানপত্রে সালাম কথাটি ব্যবহার না করে তিনি দরুদ শব্দটি ব্যবহার করলেন। মানপত্রটি লিখিত ছিলো ফার্সীতে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ বিতরণ করা হয়। এই প্রথম স্বচক্ষে শাহকে দেখতে পেলাম। তাঁর সঙ্গে ছিলো দশ বছর বয়সের একটি ছেলে। শুনলাম এ ইরানের শাহজাদা। শাহবানু ফারাহ দিবাও সেখানে ছিলেন। আরো লক্ষ্য করলাম শাহ্‌র উজিররা বিশেষ পোশাক পরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শুনলাম শাহ্‌র সামনে যেতে হলে এ রকম পোশাক পরেই যেতে হতো। এ অনুষ্ঠানের পরদিন বাসে করে আমাদের তখতে জামশিদে নিয়ে যাওয়া হলো। বিরাট আয়োজন। আমরা গ্যালারিতে বসলাম। এর ঠিক উল্টোদিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের বসবার ব্যবস্থা। আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে ওদের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। সম্মানিত মেহমানদের মধ্যে ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলসীইয়ে, পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খান, ইন্ডিয়ার ভি ভি গিরি, এঁদের চিনতে পারলাম। এদের থাকবার ব্যবস্থা ছিলো তাঁবু আকারে নির্মিত এক শহরে।

আমাদের গ্যালারির সামনে তখতে জামশিদের ভগ্নাবশেষের পাশ দিয়ে একটা চওড়া পিচঢালা রাস্তা তৈরী করা হয়েছিলো। তখতে জামশিদকে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। দিনের বেলা অবশ্য সে সজ্জা আমরা দেখিনি।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলো ইরানী সৈন্যদের প্যারেড। এটা যে কতো আকর্ষণীয় হতে পারে সেটা আগে কখনো ভাবতে পারিনি। আগের বছর ১৯৭০ সালের ১লা অক্টোবর পিকিং-এ কম্যুনিস্ট বাহিনীর প্যারেড দেখেছি। কিন্তু ইরানের প্যারেডের এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো যা অন্যত্র কোথায়ও চোখে পড়েনি। দু'হাজার বছর আগে সাইরাসের আমল থেকে যে পোশাক-আশাক এবং অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যরা ব্যবহার করতো প্রথম দলটি ঠিক তেমনি পোশাক পরে এবং অস্ত্র নিয়ে দর্শকদের সামনে মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসে। প্রত্যেক সৈন্যেরই মুখে জমকালো দাড়ি, হাতে বর্শার মতো একটা অস্ত্র, সঙ্গে ঢালও। আমরা ইতিহাসের বইতে যে সমস্ত ছবি দেখতে অভ্যস্ত তাই হঠাৎ চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠলো। শুনলাম শাহের নির্দেশেই ইরানী পন্ডিতেরা পুরানো বইপত্র, ছবি, শিলালিপি এ সমস্ত ঘেঁটে শিরস্ত্রাণ থেকে পাদুকা পর্যন্ত ঠিক যে ধরনের জিনিস দু'হাজার বছর আগে ব্যবহৃত হতো সে রকম সাজ-সজ্জা সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম দল এগিয়ে গেলে তাদের পরের দল প্রকান্ড মোষের গাড়ীর সঙ্গে মার্চ করতে করতে এগিয়ে এলো। তখন খেয়াল হলো যে এককালে ভারী কামান ইত্যাদি মোষের গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হতো। এরপর আসে ঘোড়সওয়ার। বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে ক্রমান্বয়ে এ সমস্ত দলের পোশাকে এবং সমর সজ্জায় পরিবর্তনের আভাস দেওয়া হচ্ছিলো।

সর্বশেষ যে দলটি আসে তাদের সঙ্গে আধুনিক কালের কামান ইত্যাদি ছিলো। মার্চ শেষ হতে দু'ঘন্টার উপর সময় লাগে। এ দু'ঘন্টায় ইরানের দু'হাজার বছরের ইতিহাসের এক প্রদর্শনী আমরা দেখলাম। কোথায়ও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। পরে শুনেছি এই যে নিখুঁত প্রদর্শনী, এর পেছনে ছিলো দশ বছরের সাধনা।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শাহ রাষ্ট্র প্রধানদের যে নৈশ ভোজে আপ্যায়ন করেন তাকে ইরানের ইংরেজী পত্রপত্রিকায় 'ব্যাংকুয়েট অব দ্যা সেঞ্চুরি' বা শতাব্দীর সবচেয়ে জমকালো ভোজ সভা বলে আখ্যায়িত করে। এই জিয়াফতের প্রতিটি আইটেম প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত রেস্তোরা 'ম্যাক্সিমস' থেকে বিমান যোগে আনানো হয়। তার মধ্যে ছিলো ফরাসী শ্যামপেন এবং ময়ূরের মাথা। ময়ূর পরিবেশন করার কারণ ইরানের রাজ সিংহাসনকে ময়ূর সিংহাসন বলা হতো। বলা প্রয়োজন যে শ্যামপেন বা ময়ূরের মাথা কোনোটিই হালাল খাদ্য নয়। তবে শাহ ধর্ম একেবারে মানতেন না। ইরানের মতো ধর্ম প্রধান দেশে তার এই হঠকারিতা পরবর্তীকালে তাঁর পতনের একটা মূল কারণ।

আমরা সাধারণ প্রতিনিধিরা যে ডিনারে আপ্যায়িত হলাম সেখানেও দেখলাম গরু, ভেড়া, মুরগীর সাথে শূকরের রোস্ট। আমি জানতাম যে মুসলমান কেউ কেউ গোপনে শূকর খায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মুসলমান দেশে শূকর পরিবেশনের অভিজ্ঞতা এই আমার প্রথম। এই ভোজ সভায় ডক্টর হোসাইন নসর স্ত্রীক শরীক হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী পরা ছিলেন মিনি স্কার্ট। আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলাম। ডক্টর হোসাইন নসর ইসলাম সম্পর্কে অনেক বই লিখেছেন এবং বিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে মুসলমান পন্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি। তাঁরই স্ত্রী মিনি স্কার্ট পরে একটা ভোজ সভায় উপস্থিত হবেন, এটা আমি আশা করিনি। এ আমার রক্ষণশীলতা হতে পারে, কিন্তু কোন রূপেই এই আচরণের সমর্থন করতে পারিনি।

শিরাজে দু'জন বিখ্যাত ইরানী কবির মাজার। একজন হচ্ছেন হাফিজ যিনি চৌদ্দশ' শতাব্দীতে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি কবিতা পাঠিয়ে ছিলেন। আর একজন হচ্ছেন শেখ সাদী। তিনি শুধু কবিই নন, একজন সুফি হিসাবেও বিখ্যাত। এঁদের মাজার জিয়ারত করলাম। হাফিজ যে নহরের কথা তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন সেটি এখনো প্রবহমান। আর শেখ সাদী যে কুয়োর পানি ব্যবহার করতেন সেটাও বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। হাফিজের মাজারের পাশে তাঁর দিওয়ানের এক কপি রক্ষিত ছিলো। ইরানী এক ভদ্রলোককে ওটা থেকে আবৃত্তি করে শোনাতে অনুরোধ করলে তিনি বললেন যে তিনি পন্ডিত নন, ছ'শ বছরের পুরানো কবিতা তিনি হয়তো ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন না। কারণ ফার্সী ভাষার উচ্চারণ একেবারে বদলে গেছে। আমাদের দেশে যেভাবে ফার্সী উচ্চারিত হয় তার সঙ্গে ইরানের উচ্চারণের সঙ্গতি নেই। যেমন আমরা জানি যে রুটির ফার্সি হচ্ছে 'নান' কিন্তু ইরানীরা বলে 'নুন' কিন্তু বানানে কোন পরিবর্তন হয়নি।

এর পরের অনুষ্ঠান তেহরানের অদূরবর্তী এক জায়গায় নব নির্মিত শাহইয়াদ মনুমেন্টের উদ্বোধন। এটা ইরানী আর্কিটেক্টরা তৈরী করেন। এর চারদিকে ছিলো ফুলের বাগান, নিচের হলটিতে একটি লাইব্রেরী। উদ্বোধন করলেন শাহ নিজে। এই মনুমেন্টের নকশা অনুকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশে সাভার মনুমেন্টে।

শিরাজে থাকাকালীন 'কাইহান ইন্টারন্যাশনাল' নামক ইংরেজী পত্রিকায় সাবেক গবর্নর মোনেম খাঁর হত্যার খবর পড়ি। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে আততায়ীরা ঢাকা শহরেও প্রবেশ করেছে এবং পরিচয় নির্বিশেষে যারাই মুবিজবাদী নয় তাদের খতম করার চেষ্টা করছে। ১৯৭১ সালে সংঘর্ষের দু'বছর আগে ১৯৬৯ সালে মোনেম খাঁকে গবর্নর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। তারপর তাঁর কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলো না। তিনি কোনো বক্তৃতা বিবৃতি দেননি। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনার মধ্যেও তাঁর কোনো ভূমিকা ছিলো না। কিন্তু তিনি যে সাত বছর গবর্নর ছিলেন সে সময় তাঁকে অনবরত আইয়ুব খানের দালাল হিসাবে চিত্রিত করা হতো।

এ খবরের পর আমি স্থির করি যে যথাশীঘ্র আমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিৎ। ফেরার পথে ডক্টর আলী আশরাফের বাসায় উঠেছিলাম। আশরাফ এবং তাঁর স্ত্রী আসিয়া আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলো যে আমি যেনো আসিয়ার ছোট বোন শেলির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে কোনো আলোচনা না করি। আসিয়া বললো শেলি আগুন হয়ে আছে, কি বলে ফেলবে ঠিক নেই। কিন্তু এই নীরবতা কয়েক ঘন্টার বেশী রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। শেলিই আমাকে বলে বসলো, ওদের সঙ্গে আর থাকা যাবে না।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম কাদের কথা বলছো শেলি? শেলি জবাব দিলো, পাকিস্তানীদের কথা। সে আরো বললো, আমরা ভারতের গোলাম হয়ে থাকতে রাজী কিন্তু পাঞ্জাবীদের সঙ্গে আর নয়। সে অভিযোগ করলো যে আমি এখনো কেনো পাকিস্তানের সমর্থন করি সে বুঝতে পারছে না। তার দুলাভাই অর্থাৎ ডক্টর আলী আশরাফ তো নিউট্রাল, কোনো পক্ষই গ্রহণ করছেন না। আমি বললাম, শেলি পাকিস্তানের ইতিহাস তুমি মোটেই জান না বলে এসব কথা বলছো। আর যে সংঘর্ষ হচ্ছে তা পাঞ্জাবী-বাঙ্গালীর সংঘর্ষ নয়। সেটা হলো পাকিস্তানের অস্তিত্বের সংগ্রাম। যদি খোদা না খাস্তা পাকিস্তানের পতন ঘটে একথা মনে রাখবে যে আমাদের উপর গোলামির যে লানত নেমে আসবে সেখান থেকে উদ্ধার পেতে আমাদের কয়েক শতাব্দী লেগে যেতে পারে। আমার নিজের সমাজের স্বার্থেই আমি পাকিস্তানের সমর্থন করছি। আর এ যুদ্ধের সময় যেখানে এক পক্ষ পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে উদ্যত সেখানে নিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে তাদেরই সমর্থন করা। আমি আরো বললাম যে আমি ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি। হয়তো আমিও নিহত হবো। কিন্তু শেলি তুমি এটা মনে রাখবে যে আমি যে কথাগুলো বললাম তা অসত্য নয়। তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে এ ভরসা হয়তো নেই কিন্তু আমার কথাগুলো মনে রেখো।

ডক্টর আলী আশরাফের বাসায় করাচী ইউনিভার্সিটির বাঙলা বিভাগের লেকচারার মোহাম্মদ ফারুকের সঙ্গে দেখা হলো। ফারুকের দু'ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে আমার কাছে পড়েছে। ওদের আব্বা ছিলেন মুসলিম লীগের সদস্য। ফারুককে করাচীতে এসে যখনই দেখেছি তখনই তার মুখে শুনেছি পাকিস্তানের ভূয়সী প্রশংসা। এবার দেখলাম সে বদলে গেছে। আমার কাছে প্রকাশ্যে মুজিববাদীদের সমর্থন করতে ইতস্ততঃ করছিলো। কিন্তু তার সহানুভূতি কোন্ দিকে সেটা ধরা পড়লো যখন সে বিমান বাহিনীর মতিয়ুর রহমানকে একজন দেশপ্রেমিক বলে উল্লেখ করলো। এই মতিয়ুর রহমান একটি পাকিস্তানী বিমান নিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে বাধা দেয় পশ্চিম পাকিস্তানী এক শিক্ষানবীশ। ধ্বস্তাধস্তিতে প্লেন ধ্বংস হয় এবং উভয়েই নিহত হয়। এর মধ্যে দেশপ্রেমের কি লক্ষণ ফারুক পেয়েছিলো, আমি জানি না। আমি আপত্তি করায় সে কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিলো। আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ফারুকের মানসিকতায় একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

ফারুক এবং শেলির মতো পশ্চিম পাকিস্তানবাসী আরো অনেক বাঙালী যারা পঁচিশে মার্চের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি – প্রচারণার উপর নির্ভর করে বলতে শুরু করে যে সংঘর্ষের জন্য এক তরফাভাবে পাকিস্তান আর্মিই দায়ী। এবারো লক্ষ্য করলাম যে সত্তর সালের ইলেকশনের পর আওয়ামী লীগ যে সন্ত্রাসমূলক অভিযান চালিয়ে আসছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজপত্রে তার খবর বিশেষ দেওয়া হয়নি। এবং কেন্দ্রীয় সরকারও এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলেন। শুনলাম ইতিহাস বিভাগের ডক্টর আবদুর রহীম, যিনি স্থায়ীভাবে করাচীতে বসবাস করার উদ্দেশে বাড়ী তৈরি করিয়েছিলেন, তিনিও পাকিস্তানের উপর আস্থা হারিয়েছেন। ডক্টর রহীম ছিলেন আমার সমবয়সী এবং আমরা একই বছরে ঢাকা থেকে এমএ পাশ করি। মুসলমান ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি যে বই লিখেছেন তাতেও পাকিস্তানের আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা তিনি জানিয়েছেন। অথচ এবার আমাকে বলা হলো যে পাকিস্তানের উপর তিনি এতটা ক্ষিপ্ত যে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আক্রমণ করতেও তিনি বা তাঁর সন্তানেরা কসুর করবে না। এ সংবাদে দুঃখ পেয়েছিলাম বৈকি। মানুষের আদর্শের ভিত এত সহজে নড়ে যেতে পারে এ কথা কখনো ভাবিনি। অথচ তখনো হাজার হাজার বাঙালী নিরাপদে পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বিহারী হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার কথা কখনো ওঠেনি। করাচী ক্যাম্পাসেও প্রচুর বাঙালী ছাত্র এবং শিক্ষক বাস করতেন। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন ডক্টর আলী আশরাফ, বাঙলার হেড ফারুক, ইতিহাসে অধ্যাপক ছিলেন ডক্টর আবদুর রহীম। এঁদের কারো উপর কোনো প্রতিশোধ নেওয়ার কথা তো ওঠেনি বরঞ্চ এঁরা স্বেচ্ছায় করাচীর চাকরী ছেড়ে না দিলে অনায়াসে শেষ পর্যন্ত কাজ করে যেতে পারতেন। বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও করাচী ইউনিভার্সিটির বাঙলা বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া করাচীর নজরুল ইনস্টিটিউট সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এখনো পরিচালিত হচ্ছে এবং এঁরা প্রতি বছরই কবির জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করে। এদিকে বাংলাদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইকবাল হলের নাম বদলিয়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল করেছি। জিন্নাহ হলের নাম হয়েছে সূর্যসেন হল।

ঢাকায় ফিরে শুনলাম যে বিভিন্ন দিক থেকে ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছে। অধিকাংশ স্থলেই পাকিস্তান আর্মি ওদের সঙ্গে সোজাসুজি যুদ্ধ না করে সরে আসছে। ওদিকে দিল্লীতে ইন্দিরা সরকার প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির কথা প্রকাশ্যেই বলছে। ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে ইয়াহিয়া সরকার যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে আর্মি সরিয়ে নিয়ে যায়, সেটাই হবে এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। অন্য কোনো সমাধান তিনি মানতে রাজী নন। তার মানে প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রকে কলা কৌশলে এবং প্রয়োজন মতো সামরিক অভিযান চালিয়ে খন্ড বিখন্ড করার অভিযানে ভারত প্রকাশ্যভাবেই আত্মনিয়োগ করেছিলো।

কিন্তু এই যে নীতি-বিরুদ্ধ এবং জাতিসংঘের সমস্ত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী এক উদ্যোগ ভারত গ্রহণ করে, তার প্রতিবাদ দু'একটি মুসলিম রাষ্ট্র ছাড়া আর কোথাও হয়নি। আমার মনে আছে তখন বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এলেক ডগলাস হিউম। তিনি কমন সভায় ঘোষণা করেন যে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার একটি সামরিক সমাধানের জন্য বৃটেন অপেক্ষা করবে।

মিসরের ভূমিকা ছিলো আরো রহস্যময়। ১৯৫৬ সালে ইসরাইল যখন সুয়েজের উপর আক্রমণ চালায় তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, মিসর এবার তার প্রতিশোধ নেয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন বলেছিলেন যে ইসরাইল, বৃটেন ও ফ্রান্সের মোকাবিলা করার শক্তি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নেই। কারণ শূন্যের সাথে শূন্য যোগে শূন্যই হয়। আগেই বলেছি এতে মিসর খুব ক্ষুণ্ন হয়। ১৯৭১ সালে ইউরোপ থেকে বিদ্রোহীদের কাছে যে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হতো সেগুলি মিসর হয়েই এ দেশে পৌঁছাতো। অন্যদিকে পাকিস্তান শ্রীলংকার কাছ থেকে প্রচুর সহানুভূতি পেয়েছে। কারণ সেই সময়ই শ্রীলংকাবাসী তামিল সম্প্রদায় এক বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন শুরু করে। শ্রীলংকা সরকার জানতেন যে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন যদি সাফল্য লাভ করে তবে অনুরূপ যুক্তি দিয়ে তামিলেরা শ্রীলংকায় আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার চেষ্টা করবে।

ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ

অক্টোবরের শেষে আমি আরেকবার পশ্চিম পাকিস্তানে যাই। এবার ইসলামাবাদে। ইসলামাবাদে কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ছিলাম রাওয়ালপিন্ডিতে ইস্ট পাকিস্তান হাউজে। সেখানে একদিন প্রফেসর গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরীর সাথে দেখা। তিনি এককালে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন এবং কিছুকাল ইয়াহিয়া খানের এডভাইজারও ছিলেন। তিনিও ইস্ট পাকিস্তান হাউজে থাকতেন। প্রফেসর চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার সাথে প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ হয়েছে কি? তিনি হয়তো আপনার মতো ব্যক্তির মুখে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা শুনতে পেলে উপকৃত হবেন। আমি বললাম আপনি যদি ব্যবস্থা করতে পারেন আমি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করতে পারি। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। পরদিন সরকারী গাড়ী এসে আমাকে প্রেসিডেন্টের বাসভবনে নিয়ে যায়। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আর কেউ ছিলেন না। মনে হলো তিনি আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে চান। আমি তাঁকে প্রথমেই বললাম, আমি একজন সাধারণ নাগরিক। আপনি অভয় দিলেই আমি খোলাখুলি কথা বলতে পারি। প্রেসিডেন্ট বললেন, আপনার

চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনি মন খুলে কথা বলুন। আমি তাঁকে বলি যে আপনারা পাকিস্তান রক্ষার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আর্মি পূর্ব পাকিস্তানে কাউকে বিশ্বাস করে না। সেজন্য এখনো যারা পাকিস্তান আদর্শে বিশ্বাসী তারা ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ছে। ২৫শে মার্চ আর্মি যে ক্রাকডাউন করে তার মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির উপর হামলা করে কয়েকজন শিক্ষক হত্যার ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেটা কি আপনি জানেন? যাঁরা নিহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া আপনি নিজে দু'বার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। একবার ২৬শে মার্চ এবং দ্বিতীয়বার জুন মাসে। আমি অতি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে দু'বারের বক্তৃতায়ই পূর্ব পাকিস্তানে সমস্ত অধিবাসীর দেশ প্রেমের উপর কটাক্ষপাত করা হয়েছিলো। পূর্ব পাকিস্তানে এখনো যে লক্ষ লক্ষ লোক পাকিস্তানে বিশ্বাস করে সে কথা আপনার বক্তৃতায় উল্লেখ ছিলো না। তাদের সহযোগিতা আপনি কামনা করেননি; ঢালাওভাবে আওয়ামী লীগের নিন্দা করেছেন এমন ভাষায় যাতে অনেকের ধারণা হতে পারে যে পূর্ব পাকিস্তানবাসী সবাই আওয়ামী লীগের সমর্থক।

ইয়াহিয়া খান স্বীকার করলেন যে তাঁর ভুল হয়েছে। তাঁর অফিসাররা তাঁকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেননি। তিনি বললেন পরবর্তী সময়ে আমি যখন বক্তৃতা করবো, আশা করি, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

বলাবাহুল্য যে এই সাহায্যের প্রয়োজন আর হয়নি। কারণ তার আগে ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটে। তবে আমি আমার কথাগুলি প্রেসিডেন্টকে বলতে পারায় স্বস্তি অনুভব করেছিলাম। কারণ আমি আগাগোড়া লক্ষ্য করছিলাম যে ২৫শে মার্চ যেমন তেমনি পরেও নির্বুদ্ধিতার কারণে আর্মি সাধারণ লোকজনকে পাকিস্তান বিরোধী করে তুলছিলো।

অক্টোবর থেকে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। কলকাতাস্থিত স্বাধীন বাঙলা সরকারের প্রচারণাও আরো তীব্র হয়ে উঠে। ঐ প্রচারণা যাঁরা পরিচালনা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আখতার মুকুল ও সৈয়দ আলী আহসান। আখতার মুকুল 'চরমপত্র' বলে একটা প্রোগ্রাম করতেন যাতে অন্যান্য কথার মধ্যে যারা তখনো বিদ্রোহে যোগদান করেনি তাদের বিরুদ্ধে হুমকি দেয়া হতো। আলী আহসান যেহেতু দাবী করতো সে পীর বংশের সন্তান সে নেমেছিলো ধর্মীয় প্রচারণায়। কোরানের আয়াত পড়ে ব্যাখ্যা করে বলতো যে ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা জেহাদের শামিল। এবং পূর্ব পাকিস্তানবাসী প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। আখতার মুকুলের চরমপত্রে যে সমস্ত ব্যক্তির প্রাণদন্ডের হুমকি থাকতো তাঁদের মধ্যে থাকতেন গবর্নর আবদুল মালেক, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, ডক্টর হাসান জমান এবং আরো

অনেকে। শুনেছি দু' একবার আমার নামও বলা হয়েছে। তবে এটা আমার নিজের কানে শোনা কথা নয়।

একদিন রাত্রে নটা বা সাড়ে নটায় ফোন এলো। আমিই ধরেছিলাম। আমার গলা শুনে অপর প্রান্ত থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন 'আপনি তা হলে বেঁচে আছেন? আমি ময়মনিসংহ থেকে বলছি। আমরা এইমাত্র কলকাতার স্বাধীন বাংলা বেতারে শুনলাম আপনার প্রাণনাশ করা হয়েছে।' এই ভদ্রলোক কোন্ দলের ছিলেন জানি না। তবে তাঁর গলার স্বরে মনে হয়েছিলো যে তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি।

প্রদেশের সর্বত্র যখন বোমাবাজি এবং লুটতরাজ হচ্ছে তখন একদিন কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক খোন্দকার মোকাররম হোসেন ফোন করে জানালেন যে, তাঁর ডিপার্টমেন্টে বারুদ জাতীয় কিছু বিস্ফোরক জমা রয়েছে। তিনি ভয় পাচ্ছেন যে গেরিলারা এগুলো চুরি করে নিয়ে ব্যবহার করবে। আর্মি যেনো এগুলো সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে। তাঁর অনুরোধ আর্মিকে জানিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরক দ্রব্যগুলি কার্জন হল এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রফেসর মোকাররম হোসেন ভয় পাচ্ছিলেন যে বিস্ফোরক চুরি হয়ে গেলে তিনি নিজে ফ্যাসাদে পড়বেন।

নবেম্বরে একদিন গবর্নর মালেকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন যে করাচীর কোনো শাহ সাহেব নাকি বলেছেন যে পাকিস্তান টিকে থাকবে। ডক্টর মালেক খুব ধর্মভীরু ছিলেন। শাহ সাহেবের এই ভবিষ্যৎ বাণীটি আক্ষরিক অর্থেই সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। পাকিস্তান অবশ্যই টিকে যায়, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা পায়নি।

ডক্টর মালেক আরো জানালেন যে যাঁদের নিয়ে কোলকাতায় প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছে তাঁরা নাকি দু'দলে বিভক্ত। এক দল চাচ্ছিলেন ছ'দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে বোঝাপড়া করে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে। এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। অপর দলের প্রধান ছিলেন তাজউদ্দিন। এঁরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ডক্টর মালেক বললেন যে এ সমস্যা নিয়ে কোলকাতায় বিতর্ক চলছে এবং শিগগিরই ভোটাভুটি করে এর মীমাংসা হবে। পরে শুনেছি যে খন্দকার মোশতাকের দল নাকি এক ভোটে হেরে যায়। তবে আমার বিশ্বাস যে প্রবাসী সরকারের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোনো কিছু করার ক্ষমতা ছিলো না। ইন্দিরা সরকারের নির্দেশেই তাঁরা পরিচালিত হতেন। সুতরাং ইচ্ছা করলেই গৃহযুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের হতো কিনা, সন্দেহ।

একদিকে যেমন স্বাধীন বাঙলা থেকে নানা কথা প্রচার করা হতো তেমনি অন্যদিকে ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফ মানেক শ'র নামে উর্দু, পাঞ্জাবী এবং পশতু ভাষায় পাকিস্তান আর্মির উদ্দেশে রোজই বক্তৃতা প্রচারিত হতো, কোনো জায়গায় লিফলেট ছড়ানো হতো। বলা হতো যে পাকিস্তান আর্মির যুদ্ধে জয়লাভ করার কোনো

সম্ভাবনাই নেই; প্রাণ রক্ষা করতে হলে সৈন্যরা যেনো অবিলম্বে অস্ত্র ত্যাগ করে এবং ইন্ডিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তবে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ রকম আত্মসমর্পণের কোনো খবরই আসেনি।

যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন পাকিস্তান আর্মি অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়েছিলো, প্রশাসনেও তারা কোনো দক্ষতা দেখাতে পারেনি। এদের চোখের সামনে বহুলোক মার্চ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন পথে ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছিল। কেউ কেউ আর্মির সহযোগিতায় ইংল্যান্ড আমেরিকা পর্যন্ত গেছে। একদিন শুনে অবাক হলাম যে ইসলামী ইতিহাসের অধ্যাপক এ বি এম হবিবুল্লাহ যাঁকে টিক্কা খান বরখাস্ত করেছিলেন –করাচী হয়ে প্রথমে আফগানিস্তানে যান এবং সেখানে থেকে লন্ডনে উপস্থিত হন। পশ্চিম পাকিস্তানে আটক বাঙালী অফিসার যাঁরা বিদ্রোহে যোগদান করতে চান তাঁরাও আফগানিস্তান পালিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে বিমানযোগে ইন্ডিয়া চলে আসতেন। একদল মুনাফা লোভী লোক মালপত্রের মধ্যে এদের লুকিয়ে সীমান্ত পার করে দিতো। এটা একটা বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিলো।

নবেম্বরের শেষ দিকে অবস্থা আরো সংকটময় হয়ে ওঠে। ভারতীয় অনুপ্রবেশের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। শোনা যায় যে, কোন্ তারিখে ইন্ডিয়ান আর্মি ঢাকা দখল করবে সেটাও নাকি স্থির হয়ে গেছে।

উপায়ন্তর না দেখে তেসরা ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এটাও ছিলো তার একটি ভুল পদক্ষেপ। কারণ এতদিন ইন্ডিয়া পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করলেও সে যে প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তান দখল করার চেষ্টা করছে, সে কথা স্বীকার করতো না। এবার আর সে বাধা রইলো না। ইন্ডিয়ান আর্মি পশ্চিম পাকিস্তানেও আক্রমণ করতে শুরু করে। ব্যাপারটা তখন জাতিসংঘে পেশ করা হয়। সাধারণ পরিষদে ভোটাধিক্যে যুদ্ধ বন্ধ করার আবেদন জানানো হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কিন্তু ইন্ডিয়ার পক্ষে ভিটো দিয়ে রাশিয়া এই প্রস্তাব বানচাল করে।

ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর থেকে ঢাকার উপর বিমান আক্রমণ শুরু হয়। দশ কিংবা এগারই ডিসেম্বর একদিনে যখন এগারটি ভারতীয় বিমান ভূপাতিত হয় তখন হঠাৎ ঢাকার আকাশ-বাতাস পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। এই আকস্মিক বিজয়ে পাকিস্তানের প্রতি জনসাধারণের আস্থা আবার ফিরে আসে। কিন্তু এটা ছিলো ক্ষণিকের ব্যাপার। এরপর ভারতীয় আক্রমণে পূর্ব পাকিস্তানে যে কয়টি বিমান ছিলো তা ধ্বংস হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান আরো অরক্ষিত হয়ে পড়ে, কারণ বিমানের সহযোগিতা না পেলে আধুনিককালে স্থল বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

তবু যে রহস্য আমরা কখনো বুঝতে পারিনি সে হলো পাকিস্তান আর্মি কেনো কোলকাতার উপর হামলা করলো না। আমি আগেই বলেছি যে জেনারেল নিয়াজীর স্ট্রাটেজি বুঝবার সাধ্য আমাদের ছিলো না। কোনো সেকটরেই তিনি আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। অথচ আর্মি অফিসাররা বলে বেড়াতেন যে সাহসে ও বীর্যে একজন পাকিস্তান সেনা দশ জন ইন্ডিয়ান সৈনিকের সমান। এই আস্ফালনের কোনো পরীক্ষাই হয়নি।

১৩ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় ইন্ডিয়ান ছত্রী বাহিনী অবতরণ করবে বা করছে এ রকম গুজব ছড়ায়। এতে আতঙ্ক আরো বেড়ে যায়। ১৩ এবং ১৪ই ডিসেম্বর ভাইস চান্সেলরের বাসার উপরেও বিমান আক্রমণ হয়। কয়েকটা গুলী আমাদের বাগানে এবং দালানের দু'এক জায়গায় লাগে। নিষ্প্রদীপ মহড়ার জন্য তখন বাসার দরজা-জানালার কাঁচে কালো কাগজ এঁটে দেওয়া হয়েছিল। সন্ধ্যার পর অধিকাংশ বাতি নিভিয়ে রাখা হতো। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, এই বাসাটাও একটি সামরিক টার্গেটে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া মহসিন হল অঞ্চলেও একদিন বোমা পড়ে। কারণ একটি গুজব ছড়িয়েছিলো যে পাকিস্তান আর্মি কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছে।

১৪ই ডিসেম্বর

১৪ তারিখ রাত্রে বাসার উপর বিমান আক্রমণের পর আমি স্থির করি যে এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। কিন্তু এখান থেকে বেরুনোও ছিলো বিপদজনক, সারা শহরে তখন কারফিউ। আমি একজন আর্মি জওয়ানকে ডেকে কারফিউ-এর মধ্যে আমাদের পুরানো বাসা ১০৯ নম্বর নাজিমুদ্দিন রোডে পৌঁছে দিতে বললাম। সে রাজী হলে কাপড়ের দুটো সুটকেস নিয়ে আমরা এ বাসায় ফিরে আসি। সব মালপত্র পড়ে থাকে ভাইস চান্সেলর ভবনে। এর অধিকাংশ আর পরে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আর একটা ঘটনা বোধহয় উল্লেখ করা দরকার। নবেম্বরের শেষ দিকে পাকিস্তান আর্মি কতটা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রমাণ পেলাম যখন শুনলাম যে রাও ফরমান আলী গোপনে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব ইন্ডিয়াকে দিয়েছে। তাঁর প্রস্তাবের শর্ত কি ছিলো, জানি না। কিন্তু এ গুজব একেবারে ভিত্তিহীন ছিলো না বলে আমার বিশ্বাস। জেনারেল নিয়াজী নাকি চেয়েছিলেন শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। দরকার হলে আর্মি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় নিতো কিন্তু এমন কিছুই হয় নাই। তাছাড়া গবর্নর মালেকও কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁর সরকারের পক্ষ থেকেও আত্মসমর্পণের কথা

ওঠে। কিন্তু মন্ত্রী সভার সব সদস্য এতে সম্মত হননি। ১৪ তারিখে গবর্নর হাউজে মন্ত্রী সভার বৈঠক হবার কথা ছিলো। এই সভায়ই স্থির হতো যে সরকার আত্মসমর্পণ করবে না যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কিন্তু এই মিটিং হতে পারেনি। তার কারণ মিটিং-এর খবর কোন গুপ্তচর দিল্লীতে পৌঁছায়। তার মানে করাচীতেও গুপ্তচর বৃত্তিতে কিছু লোক নিযুক্ত ছিলো। মিটিং-এর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সভা কক্ষের উপর বোমা হামলা হয়। ডক্টর মালেক এবং মন্ত্রীরা কোনো রূপে বেসমেন্টে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।

দেশের ভিতরে গুপ্তচর বৃত্তির এটাই একমাত্র প্রমাণ নয়। যে সমস্ত কান্ড হচ্ছিলো তাতে সন্দেহের কারণ ছিলো যে এ অঞ্চলে বেসামরিক এবং সামরিক সব খবর নিয়মিতভাবে ইন্ডিয়াতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কারা এ গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছিলো জানি না। তবে কে বিশ্বাসযোগ্য এবং কে বিশ্বাসযোগ্য নয় তা স্থির করা রীতিমতো মুশকিল হয়ে পড়ে। নবেম্বরের আগে বা বোধ হয় সেই মাসেই কুর্মিটোলার ক্যান্টনমেন্ট সম্পর্কে এক গুজব আমাদের কানে আসে। শুনলাম ক্যান্টনমেন্টের মসজিদের ইমাম গুপ্তচর। সে ভালো কেরাত করে কোরআন শরীফ পড়তে পারতো। কিন্তু প্রমাণিত হয় সে আসলে একজন শিখ, গুপ্তচর বৃত্তির জন্যই এসব শিখেছিলো। ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের সেক্রেটারিয়েট এবং অন্যান্য অফিস সম্পর্কে অনেক খবর রটতে থাকে। এ রকম একটি খবরের ভিত্তিতে একবার আর্মি ইউনিভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। আমি মহা মুশকিলে পড়ি। কারণ এটা নিশ্চিত ছিলো যে বিদ্রোহী দল এজন্য ভাইস চান্সেলরকে দোষারোপ করবে। তারপর অবশ্য আমার অনুরোধে এঁদের সবাইকে একজন একজন করে ছেড়ে দেয়। এদের মধ্যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের আহসানুল হক ও রশিদুল হাসান ছিলো। খালাস করার সময় আর্মি নাকি এদের শিখিয়ে দিয়েছিলো যে আপনারা প্রথমেই যেয়ে ভাইস চান্সেলরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

১৪ই ডিসেম্বরের আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেদিন অফিসে বসা মাত্র খবর এলো যে ঐ দিন ভোর রাত্রে নাকি একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ইউনিভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষককে ধরে নিয়ে গেছে। যারা এসেছিলো তারা নাকি আর্মির লোক নয় কিন্তু এরা কারা সে রহস্য আজো উদঘাটিত হয় নাই। ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছাড়াও আরো কিছু ব্যক্তিকে পাকড়াও করে এই দল নিয়ে যায় এবং ১৬ই ডিসেম্বরের পর লাশ মীরপুরের আশেপাশে পাওয়া যায়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন বাংলার মুনীর চৌধুরী, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের রশিদুল হাসান, ইতিহাসের গিয়াসউদ্দিন আবুল খায়ের এবং সন্তোষ ভট্টাচার্য। আরো ছিলেন ইউনিভার্সিটির সহকারী মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার মুর্তজা।

ডাঃ মুর্তজা পিকিং পন্থী বামপন্থী দলের সমর্থক ছিলেন এবং বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন না। এই কারণে এদের মৃত্যু রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখা দরকার যে এঁদের ব্যক্তিগত মতামত যাই হয়ে থাকুক, প্রকাশ্যভাবে এরা কেউ গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। অবশ্য এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে তখন শিক্ষক যারা কোনো রকমে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রায়ই কোলকাতা থেকে নানা হুমকি দেওয়া হতো। ১৬ তারিখে যখন পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটে তখনো আমরা কেউ জানতাম না এ লোকগুলোর কি হয়েছে। এবং আজ পর্যন্ত আর্মি এবং রাজাকারদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শোনা গেলেও এদের মৃত্যু রহস্য সন্দেহাতীতভাবে উদঘাটিত হয় নাই। যখন পাকিস্তান আর্মি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তার পূর্বক্ষণে তাদের বা তাদের সমর্থকদের এ রকম কান্ড ঘটাবার সাহস না থাকারই কথা।

১৪ই ডিসেম্বর যখন চারদিকে আতঙ্ক এবং যে কোন মুহূর্তে পাকিস্তান সরকারের পতন ঘটবে বলে শোনা যাচ্ছে তখন রাত্রে খুলনা থেকে একজন আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে ঢাকার অবস্থা কেমন? আমি যখন বললাম যে এখানের অবস্থা ভালো নয়, সে জানালো যে খুলনার দিকে ইন্ডিয়ান আর্মি প্রবেশ করতে পারেনি। পাকিস্তান আর্মি স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় ইন্ডিয়ানদের বাধা দিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত ১৬ই ডিসেম্বর যখন জেনারেল নিয়াজী জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন তখন কিশোরগঞ্জ, সিলেট এ রকম বহু জায়গায় যুদ্ধ চলছিলো। কিশোরগঞ্জে মওলানা আতাহার আলী ১৬ তারিখের পরও কয়েকদিন পাকিস্তানের পতাকা নামাতে রাজী হননি। পরে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে পতাকা নামাতে রাজী করানো হয়।

১৫ই ডিসেম্বর রাত্রের অবস্থা বর্ণনা করা সহজ নয়। তখন অনেক গেরিলা ঢাকায় প্রবেশ করেছে। সারা রাত ভরে গোলাগুলির আওয়াজ কানে আসতে থাকে। আরো শুনি যে আগামীকাল রমনার মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান আর্মি আত্মসমর্পণ করবে, সত্য জেনেও তখনো এ কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত ছিলো যে পাকিস্তান সত্যি সত্যি ভেঙ্গে পড়ছে। সারারাত ধরে ৪৭ সালের আগস্ট মাসের সে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আদর্শবাদের কথা ভাবি। যারা তখন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে পূর্ব বাংলার আকাশ বাতাস ভরে তুলেছিলো তাদেরই একদল আজ 'জয় বাংলা' চিৎকার করে আহলাদে ফেটে পড়ছে– এ ছিলো আমার জন্য এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। মনে হয়েছিলো আমরা যেনো এলিসের ওয়ান্ডার ল্যান্ডের মতো কোনো দেশের অধিবাসী যেখানে কোনো কিছুরই স্থিরতা নেই। ভাবলাম এটা কি আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য? মনে হয়েছিলো, যে ফজলুল হক সাহেব ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তিনিই ১৯৪৬ সালে ইলেকশনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং একবার

কোলকাতা হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার পথে পাকিস্তান সম্বন্ধে এমন এক উক্তি করেছিলেন যার ফলে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তাঁকে দেশদ্রোহী বলতে বাধ্য হন। মওলানা ভাসানী যিনি সিলেটের গণভোটের সময় এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, তিনিও একবার পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে ছিলেন। এ রকম আরো অনেক লোকের কথা জানতাম যাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুহূর্তেই পাকিস্তানের আদর্শে আস্থা হারিয়ে নানা কথা বলতেন। আমি বরঞ্চ কাজী আবদুল ওদুদ বা সৈয়দ মোজতবা আলীর মতো ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি। তাঁরা পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেননি এবং প্রথমাবধি পশ্চিম বাংলায় থেকে যান। তারপর কংগ্রেসের মুসলিম সদস্য যাঁরা পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন তাদের মনোবৃত্তিও কিছুটা বুঝতে পারতাম। কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্ষুব্ধ হয়ে নেহেরুকে এক চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু যারা এককালে পাকিস্তানের বদৌলতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন এবং যাঁরা পাকিস্তান না হলে সমাজের নিম্নস্তরে পড়ে থাকতেন তাঁরা এবং তাঁদের সন্তানেরা যে যুক্তিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেই যুক্তি আমার বোধগম্য ছিলো না।

১৫ তারিখ রাত্রে আরো ভাবি যে, যে পরিবর্তন আসছে তাতে আমার নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনো স্বস্তিই পাচ্ছিলাম না। নয় মাসে চারদিকে প্রতিহিংসার আগুন যেভাবে জ্বলে উঠেছিলো তাতে দেশের এবং সমাজের কোনো মঙ্গল হতে পারে এ কথা বিশ্বাস করা ছিলো আমার পক্ষে অসম্ভব।

তাছাড়া আরেকটা কথা ভাবি, এই তথাকথিত মুক্তিবাহিনী যদি নিজেরা যুদ্ধ করে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো তাতেও অগৌরবের কিছু আমার চোখে পড়তো না। বিচ্ছিন্নতাকে আমি সহজে মেনে নিতে পারতাম না সত্যি কিন্তু তা হলেও মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে পারতাম যে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তান টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু যা হতে যাচ্ছিলো সেতো বিদেশী একটি রাষ্ট্রের সাহায্যে একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা মাত্র। ইন্ডিয়ান আর্মি এই দেশকে যুদ্ধে পরাজিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে এটা দখল করতে আসছিলো। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বা যারা এখন নিজেদের বাঙালী বলতে শুরু করেছিলো তাদের গৌরবের কি থাকতে পারে? এরা ইচ্ছা করে একটা বিদেশী শক্তির কাছে দেশকে তুলে দিতে যাচ্ছিলো এবং এর নাম দিয়েছিলো স্বাধীনতা। শুনেছি এখনো কোলকাতায় নাকি পূর্ব পাকিস্তান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ইন্ডিয়া বিজয় লাভ করেছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে কৌশলে ইন্ডিয়া বিজয় লাভ করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে তারও প্রশংসা আমি করতে পারি। কিন্তু পাকিস্তানী হিসাবে এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না।

আরও মর্মাহত হচ্ছিলাম এই ভেবে যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু অধিবাসী, সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তার মধ্যে বীরত্বের কিছু ছিল না। যুক্ত বাংলায় যেমন সংখ্যাগুরু হয়েও মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যেত, এখানেও তাই। অথচ এটাকে বলা হচ্ছিল বাঙালীর সাহস ও বীরত্বের আদর্শ।

১৬ই ডিসেম্বর ভোরে উঠে দেখলাম প্রায় বাড়ীতেই 'জয় বাংলা' পতাকা। তবে আমাদের মহল্লায় রাস্তায় কোনো উল্লাস হয়নি। দিন দশটার দিকে নাকি জেনারেল অরোরা এবং অন্যান্য ইন্ডিয়ান অফিসার রমনার মাঠে উপস্থিত হন এবং এঁদের কাছে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। শুনেছি তিনি নাকি তখন কেঁদে ফেলেছিলেন।

এ সময় গবর্নর মালেক এবং তাঁর মন্ত্রীরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই হোটেলটিকে 'নিউট্রাল গ্রাউন্ড' বলা হতো। বিদেশী সাংবাদিকরাও এখানে থাকতেন।

সবচেয়ে দুঃখ পেলাম যখন শুনলাম যে আমাদের পরিচিত কোনো কোনো পরিবার বিরিয়ানী রান্না করে ইন্ডিয়ান সৈন্যদের জন্য পাঠাচ্ছে। আমার নিজের ফুপাতো ভাই হাসিনা মঞ্জিলের সৈয়দ ফখরুল আহসানের মেয়েরা এরকম দু' ডেক পোলাও রমনা কিংবা ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে ছিলো। এ ছিলো এক অদ্ভুত দৃশ্য।

পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ হলেও ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। এই যুদ্ধ বন্ধ হয় আমেরিকার হুমকিতে। অথচ পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার জন্য আমেরিকা কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। একবার শোনা গিয়েছিলো যে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর পূর্ব পাকিস্তানের দিকে এগিয়ে আসছে। এ খবর কদ্দুর সত্য তা আমি এখনো জানি না। তবে চাপ দিলে ইন্দিরা গান্ধী যে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পাঠাতে সাহস পেতেন না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৬, ১৭, ১৮ ডিসেম্বর মহা উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটে। তখন চারদিক থেকে শুধু হত্যাকান্ডের খবর আসছিলো। পাকিস্তান সমর্থক বলে যাদের উপরই সন্দেহ হয়েছে তাদেরই বিনা বিচারে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে ছিল কয়েক হাজার বিহারী এবং বহু বাংলা ভাষী মুসলমান। ১৭ তারিখে বোধ হয় সৈয়দ আলী আহসানের ছোট ভাই সৈয়দ আলী নকী আমার সাথে দেখা করতে আসে। সে বলে, সাজ্জাদ ভাই, আপনি এখান থেকে সরে যান। আমি জবাব দিয়েছিলাম যে, আমি পাকিস্তানে বিশ্বাস করতাম এ কথা সত্য কিন্তু আমি কোনো খুন জখম বা অনুরূপ অপরাধ করিনি। আমি পালাবো কেনো? তা ছাড়া পরিবারকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আত্মগোপন করা হবে চরম কাপুরুষতা। যদি আমার নসিবে মৃত্যু থাকে সেটা রোধ করা অসম্ভব হবে। কিন্তু পালিয়ে আমি কাপুরুষতার দুর্নাম অর্জন করতে রাজী নই।

১৯ তারিখে ভাইস চান্সেলরের সেক্রেটারিকে খবর দিলাম সে যেনো ফাইল নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। সে আমাকে ফাইল পাঠিয়ে দিলো কিন্তু নিজে আসতে সাহস পেলো না। পরে শুনেছি ক্যাম্পাসে ১৬ তারিখ থেকেই আমার খোঁজাখুজি শুরু হয়।

ফাইলে আমি যে কথাগুলি লিখেছিলাম তা আমার মনে আছে। আমি লিখি যে ১৬ তারিখের পর টিক্কা খানের আদেশে যে সমস্ত শিক্ষক চাকুরীচ্যুত হয়েছিলেন তাঁদের উপর আরোপিত সে আদেশ এখন অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

১৯ তারিখ সকাল বেলা রেডিওতে যে ঘোষণা শুনি তাতে মনে হয়েছিলো যে আমার বিপদ খুব কাছিয়ে এসেছে। সেদিন রেডিও খুলতেই এক পরিচিত ছাত্র নেতা আ স ম আব্দুর রবের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে গবর্নর মালেক, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং হাসান জামানের নাম উল্লেখ করে বললো যে এঁদের কি শাস্তি হওয়া উচিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল সে প্রাণদন্ডের কথাই বলছে। আমার নাম এ ঘোষণায় ছিলো না কিন্তু ঘোষণাটি শোনা মাত্র আমার পাশের বিছানায় শোওয়া ফুপাতো ভাই সৈয়দ কামরুল আহসানকে বলি, আমাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। হয় তো শিগগির আমাদের ধরতে আসবে।

ঐ দিন বিকাল সাড়ে তিনটার সময় আমি উপর তলায় আমার বড় মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ একটা গন্ডগোলের শব্দ কানে এলো। মনে হলো কতগুলি লোক আমাদের বাড়ীর ভিতরে ঢুকে উপরে আসার চেষ্টা করছে। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা তাদের থামাতে চেষ্টা করছে। মুহূর্তেই টের পেলাম যে এরা আমার জন্য এসেছে। আমি নিচে যাওয়ার চেষ্টা করতেই আমার মেয়ে আমাকে টেনে ধরে দরোজা বন্ধ করে দিলো। আমি বললাম, এতে লাভ হবে না। তোমরা এভাবে আমাকে বাঁচাতে পারবে না। এ কথা শেষ না হতেই মনে হলো একদল লোক ছাদের উপর উঠে এসেছে। প্রচন্ড জোরে লাথি দিয়ে ছাদের দিকের দরোজাটা ভেঙ্গে ফেললো। আমাকে দেখা মাত্র বললো, 'হ্যান্ডস আপ'। যেনো আমার কাছে কোনো বন্দুক বা পিস্তল ছিলো। তারপর এ ভাঙ্গা দরোজা দিয়ে ঢুকে আমার শার্ট ধরে ওরা আমাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যায়। শীতের দিন আমার পরনে ছিলো পশমী প্যান্ট এবং শার্টের উপর কার্ডিগ্যান। চারদিকে তাকাবার অবসর ছিলো না। যারা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের সবার হাতে অস্ত্র। আমাকে যখন বাইরে নিয়ে আসা হলো তখন দেখলাম গেটের সামনে একটি খোলা জিপ। এবং জিপের দু'দিকে মহল্লার লোকজন জড়ো হয়ে আছে। কেউ কিছু বললো না। বুঝতে পারলাম আমি কতটা অসহায়। আমাকে ঠেলে ওরা জিপে উঠিয়ে দিলো। মনে হলো এই আমার শেষ যাত্রা। হয়তো এখনি নিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে।